প্রথম আলো

20 OCT 2016

ভর্তি পরীক্ষার ফল : আমরা বিচলিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলী ইমাম মজুমদার

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীন খ এবং বাণিজ্য অনুষদের অধীন গ ইউনিটের স্নাতকে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশিত হয়েছে। একটি বাংলা দৈনিকের খবর অনুসারে, খ ইউনিটে ১১ এবং গ ইউনিটে ৫ দশমিক ৫২ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন। ওই দৈনিকের ভাষ্য অনুসারে, কয়েক বছর ধরে এ দুটো ইউনিটে ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি পাস করতে পারছেন না। এবার তা স্থান নিয়েছে ৫ দশমিক ৫২ শতাংশে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ২০০ নম্বরের। এর মধ্যে ৮০ নম্বর নির্ধারিত হয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। অবশিষ্ট ১২০-এর পরীক্ষা তারা নেয়। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানে যথাক্রমে ৩০, ৩০ ও ৬০ নম্বর নির্ধারিত থাকে। ১০০টি প্রশ্নের প্রতিটির জন্য থাকে ১ দশমিক ২ নম্বর। ভুল উত্তরের প্রতিটির জন্য শূন্য দশমিক ৫ কাটা হয়। মোট পাস নম্বর ৪৮। অর্থাৎ, গড়ে শতকরা ৪০ নম্বর। তবে খ ও গ ইউনিটে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন হলেও বাংলা ও ইংরেজিতে পৃথকভাবে পাস করতে হয়। খ ইউনিটে প্রতিটির জন্য পাস নম্বর ৮, অর্থাৎ ২৭ শতাংশের কিছু কম। আর গ ইউনিটে ইংরেজিতে পেতে হয় ১০। তা-ও তো ৩৩ শতাংশের কিছু বেশি। প্রশ্নপত্র তো হয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসকে ভিত্তি করে। সে পরীক্ষায় তো যেকোনো বিষয়ে পাস নম্বর ৩৩ শতাংশ। আর পাস করতে হয় প্রতিটিতে। আর এসব পরীক্ষার্থী অনেকে জিপিএ-৫ (এ+) পাওয়া। এ গ্রেড তো আছে ভূরি ভূরি।

এ+ মানে তো তাঁরা শতকরা ৮০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছেন। শতকরা ৭০-৭৯ নম্বর পাওয়ারা থাকেন এ গ্রেডে। মাত্র দুই দশক আগেও এ মান দুর্লভ ছিল। তখন ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগ নামে ফল প্রকাশিত হতো। আর শতকরা ৬০ নম্বর পেয়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যাও ছিল সীমিত। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল ভালো হয়ে যাচ্ছে। আর তা ক্রম ঊর্ধ্বমুখী। তবে এ ফলাফল যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানের প্রকৃত জানান দিচ্ছে না, এটা অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছিল; বরং অনেকেই বলছেন, শিক্ষার মান ক্রম নিম্নমুখী। আর সেটা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যে এর বড় ধরনের একটি নজির, তা জোর দিয়ে বলা যাবে। আসনসংখ্যা সীমাবদ্ধতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব প্রার্থীকে ভর্তি করতে পারে না। তাই নেওয়া হয় ভর্তি পরীক্ষা। এতে মেধা অনুসারে ওপরের দিকে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই সুযোগ পান এখানে পড়তে। প্রার্থীসংখ্যার অনুপাতে তা খুবই কম, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ন্যূনতম পাস নম্বর পাবেন না অন্তত অর্ধেক পরীক্ষার্থী, এটা ভাবাও যায় না। বিষয়টি অপ্রিয় সত্য।

ক্রম নিম্নমুখী শিক্ষার মান নিয়ে বিভিন্ন মহলের উদ্বেগের সঙ্গে সরকারও সাড়া দিয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ-সংক্রান্ত পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে একটি কাউন্সিল করার খসড়া বিল অনুমোদিত হয়েছে। রাখঢাক না করে ব্যর্থতা মোকাবিলা করার সরকারি উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এটা উল্লেখ করা সংগত যে আমাদের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছু কৃতী শিক্ষক আছেন। তেমনি আছেন অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁরা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশ-বিদেশে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। তবু কেন গড় মানে এমনটা ঘটছে, এটা তলিয়ে দেখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে উদ্যোগটির পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এত যে জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি, এর ব্যর্থতাও অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের এ মূল্যায়ন যে সঠিক হচ্ছে না, এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়। মনে হচ্ছে, শিখুক আর না শিখুক, একরকম খামখেয়ালি করেই এ ধরনের অতিমূল্যায়নের কাজ চলছে। ফলে একরূপ কৃত্রিম তৃপ্তিতে থাকছেন ছাত্র, শিক্ষক কিংবা তাঁদের অভিভাবকেরা। তবে বেশ কিছু দূরদর্শী শিক্ষক ও অভিভাবক এ ব্যবস্থাটা মেনে নিতে পারছেন না। আবার সম্ভব হচ্ছে না এ জোয়ার ঠেকানো।

স্কুল-কলেজের কোনো কোনোটিতে ভালো লেখাপড়া হয়। আবার অনেকগুলোতে তেমন কিছুই হয় না—এটাও অসত্য নয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসহ স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা কোচিং-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে, এটাও জোর দিয়ে বলা যায়। এ অবস্থায় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা কীভাবে ন্যূনতম গুণগত মান অর্জন করবে? তা-ও কেউ কেউ করে। তবে তা নিজ প্রচেষ্টায়। শিক্ষাদানে যত্নশীল না হয়ে 'উদার' পরীক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে ফলাফল ভালো বলে সবাই দেখে থাকে। এসব ছাত্রছাত্রীর একটি বড় অংশ স্নাতক হতে চায়। চায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা। যাঁরা সফল হননি, তাঁরা থেমে থাকবেন না। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচেষ্টা নেবেন। নচেৎ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ তো রয়েছে। স্নাতক ডিগ্রি লাভে সহজ পদ্ধতিও আছে এ দেশে। আর দিন দিন এর প্রসারও ঘটছে।

> কোনো জাতিকে বিনা যুদ্ধে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। এমনটা অন্য কেউ করছে, তা আমরা মনে করছি না। সম্ভবত আমরা নিজেদের অজান্তেই এ আত্মবিনাশী পথ বেছে নিয়েছি

সুতরাং, কী ধরনের স্নাতক আমরা তৈরি করছি, এটা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ভর্তি পরীক্ষা নেয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আছে দু-একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও। সরকারি নির্দেশে মাধ্যমিকের শুধু জিপিএ ধরে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি করতে হয়। দু-একটি কলেজ জেদ ধরে আদালতের নির্দেশে অব্যাহতি পেয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে সরকার একবার সিদ্ধান্ত নিয়েও পিছিয়ে গেছে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতেই স্নাতকে ভর্তি করা হচ্ছে। মাদ্রাসা বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকেও উচ্চমাধ্যমিক অতিক্রম করা যায়। সেখানেও এ+ আর এ গ্রেডের ছড়াছড়ি। তারাও সেই গ্রেড পয়েন্টগুলোর জোরে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায়। জানা যায়, পড়াশোনা চালাতে না পেরে স্নাতক পর্যায়ে ঝরে যায় কিছু শিক্ষার্থী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দু-একটি সম্মানজনক ব্যতিক্রম ব্যতীত ভর্তিতে নেই কোনো বাধা। ডিগ্রি প্রাপ্তিও সহজ। এভাবে স্নাতক তৈরি করছি আমরা। আবার স্নাতকোত্তরও।

কোনো দেশেই সব ছাত্রছাত্রী মেধাবী হয় না। উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়। তবে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ইতি ঘটায়, তারা ভাষা, গণিত জ্ঞানসহ কিছু বিষয়ে চলতি মানের অধিকারী হয়। আর হাল আমলে অর্জন করতে হয় তথ্যপ্রযুক্তির কিছু প্রায়োগিক বিষয়ও। আমাদের উচ্চমাধ্যমিকে সবাই বাদ থাকুক, এ+ প্রাপ্তদের অনেকে এটা অর্জন করেছেন বলে দাবি করা যাবে না। আমাদের স্নাতকদের কত শতাংশ আন্তর্জাতিক বাদ থাকুক, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মান অর্জন করেছেন—এটাও খতিয়ে দেখার বিষয়। আর তা করছেন না বলেই তো সবার শঙ্কা। সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরেও গঠন করতে হয় অ্যাক্রিডিয়েশন কাউন্সিল। ভালো ছাত্র, ভালো শিক্ষক ঠিকই আছেন। কিন্তু তাঁরা আজ পড়েছেন বিপাকে। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে পারছেন খুব কম। মাপা হচ্ছে একই পাল্লায়।

আমরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করছি। সামাজিক খাতেও উন্নয়ন প্রশংসনীয়। এ অগ্রগতিকে সামনের দিকে নিতে নয়, শুধু ধরে রাখতে প্রয়োজন একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। একটি কথা আছে—কোনো জাতিকে বিনা যুদ্ধে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। এমনটা অন্য কেউ করছে, তা আমরা মনে করছি না। সম্ভবত আমরা নিজেদের অজান্তেই এ আত্মবিনাশী পথ বেছে নিয়েছি। তবে রোগ যখন ধরা পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। জেনেশুনে আমরা নিশ্চয়ই বিষপান অব্যাহত রাখব না।

● আলী ইমাম মজুমদার : সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
majumder234@yahoo.com

চিঠিপত্র

ঈশ্বরদী জংশনের দুর্গতি

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ঈশ্বরদী রেল জংশনের অবস্থা খুবই করুণ। সেই ব্রিটিশ আমলের এই স্টেশনের আজও কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। প্রতিদিন শত শত মানুষ এই জংশন ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করে। বেশ কয়েকটি আন্তনগর, মেইল, লোকাল ও কমিউটার ট্রেনের যাত্রাবিরতি রয়েছে এই জংশনে। এ ছাড়া আন্তর্দেশীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন পানি নেওয়ার জন্য এই স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারের আমলে রাজনৈতিক ইস্যুতে ঈশ্বরদী জংশনের রি-মডেলিং কাজের বরাদ্দ বাতিল হয়ে গেছে।

ঈশ্বরদী জংশনে উন্নতমানের বিশ্রামাগার নেই। স্টেশনের অফিসকক্ষে যাত্রীদের বসে থাকতে দেখা যায়, অফিসকক্ষগুলোও নিম্নমানের। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম খুব একটা বড় নয়। এর ফলে অনেক ট্রেনের বগি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে পেছনে পড়ে থাকে বলে যাত্রীদের ওঠানামা করতে কষ্ট হয়। স্টেশনটির ওপর যে পদচারী-সেতুটি আছে, সেটির অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয়। স্টেশনের নিরাপত্তা শূন্যের কোটায়। এর ছাউনিগুলোও বেশ পুরোনো। যাত্রীদের আরেকটি সমস্যা হলো টিকিট নিতে যেতে হয় পদচারী-সেতু পেরিয়ে অন্য মাথায়, ফলে অনেকে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের টিকিট পেলেও ট্রেনে ওঠার সময় পান না। নিরাপত্তার অভাবে রাতের ট্রেনগুলোতে আসা-যাওয়া করতে যাত্রীদের বেশ বেগ পেতে হয়। এ রকম নানা সমস্যা নিয়ে ঈশ্বরদী জংশন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

এস এম সাইদুর রহমান
ঈশ্বরদী, পাবনা।